Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 66-78
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

তপশিলী জাতির রাজনীতি: ঔপনিবেশিক বাংলার দৃশ্যপট

রমেশ বর্মণ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গোবরডাঙ্গা হিন্দু মহাবিদ্যালয়, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Political changes and social evolution walk almost in parallel ways. Though times any again political changes are blown away a stormy wind– the social evolution rather advances in a snail-like but unfailing pace. Moreover on its walk, it triggers off a movement that elapse deprived and exploited people. A movement itself brings in a new sense of awakening in these people, giving them a new force to change the situation. These very seeds of movement usually stay dormant inside the socio-economic and political difference of the various classes and races of the society. And once changed into a full-grown tree, the little seeds often burst into the flames of a tremendous movement, powerful enough to change the age-old structure of the society. Needless to say that, this kind of awakening or a movement is not resulted by a particular reason. Rather a number of reasons or catalysts play a strong reactive role in its making. Similarly long back in the decades of 1880, the people of Namashudra Class had an awakening call from deep inside of their class-consciousness and gave birth to a great movement, which was no exception of this 'seed-to-a-tree' rule! This article mainly has its focus on how did political awareness grow in the Namashudra Class of Bengal and how they formed different societies to protect their class interest. In fine it has also been endeavoured to bring up how this movement achieved its stage wise success.

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নানারূপ পদক্ষেপ যেমন, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, শিল্প স্থাপন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সামাজিক ক্ষেত্রে অনহস্তক্ষেপের নীতি ইত্যাদি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এবং দেশীয় উদারপন্থী সমাজ সংস্কারকেরা সামাজিক কুপ্রথা বিদূরিতকরণের জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে স্বল্প বা অধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই নিম্নবর্গীয় ও নিম্নবর্ণসম্ভূত নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য আন্দোলনের জন্মদানে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এই সমস্ত আলদোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল - ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকুরি লাভ, চাকুরি লাভের মধ্যে দিয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন ও জাতিগত সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, অস্পৃশ্যতা, ঘৃণা ও বঞ্চনার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ। ঔপনিবেশিক বাংলায় সরকারী চাকুরি ছিল আর্থ-সামাজিক মর্যাদার দ্যোতক। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দও সে কথা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর এর ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের নতুন পথের সংকেত।[১] তৎকালীন বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এই চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ অধিক মাত্রায় লক্ষ্যনীয়।

যার দল নেই, তার বল নেই'- এই অমোঘ মন্ত্র অন্ত্যজ জাতিভুক্ত মানুষদের হাতে অত্যন্ত সচেতনভাবে তুলে দিয়েছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাঁর এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল এই যে জিজ জাতির মানুষদের জাগিয়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতি বা বর্ণগত বিভাজনকে অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। দলবদ্ধ না হলে বা সম্মিলিতভাবে নিজেদের দাবীকে তুলে ধরতে না পারলে অবস্থান্তর ঘটানো কোনভাবেই সম্ভব হবে না। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়েই যে কোন জাতির আত্ম-জাগরণ ঘটে থাকে। আত্মজাগরণই হল সমাজ পরিবর্তনের মূলমন্ত্র। এই চেতনার উন্মেষ যে নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের মধ্যেই ১৮৭২ খ্রীঃ ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্ত্র প্রকৃত অর্থেই পরিস্থিতির পরিবর্তনকে অনিবার্য ও অপরিহার্য করে তুলেছিল। এরূপ পরিমণ্ডলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জেলার আমগ্রাম নামক প্রায় অখ্যাত এক গ্রামে নমঃশূদ্র মানুষদের মধ্যে স্তূপীকৃত অসন্তোষ ও পুঞ্জিভূত ক্ষোভ অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করতে না পারলেও যে ভয়াবহ অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল তার তাৎপর্যও অসীম। এই গ্রামেই নমঃশূদ্ররা প্রথম আরম্ভ করেছিল তাদের ঐক্যবদ্ধ, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিভাষানুযায়ী, “Their first organized endeavour of self-determination started in Faridpur-Bakarganj region in late 1872, when in official documents they were still being referred to as chandals.”[২] আলোচ্য সময়কালে নমঃশূদ্রদের এই আন্দোলনের কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে, নিজেদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তারা সংঘবদ্ধভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল। হিন্দুদের মধ্যেই নিজেদের সামাজিক মর্যাদার অবস্থান্তর ঘটানোই ছিল তাদের আশু উদ্দেশ্য। তাদের এই আন্দোলনের উপলক্ষ ছিল এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, আমগ্রামের চণ্ডাল মোড়লের পিতৃশ্রাদ্ধ। বাখরগঞ্জের আমগ্রামের এই মোড়ল ছিলেন যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। তিনি তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সুপ্রচলিত প্রথা-পরম্পরাকে উপেক্ষা করে স্বজাতি বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে উচ্চবর্ণসম্ভূত ব্রাহ্মণ-কায়স্থদেরও তিনি তাঁর বাড়ীতে আহার্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্য ছোট জাত বলে তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষেরা।[৩] মূলত কায়স্থদের প্ররোচনায় তারা এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এই মর্মে তাঁরা প্রদর্শন করেছিলেন বহুবিধ কারণ। তাঁরা বলেছিলেন, লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে চণ্ডাল জাতির মহিলারা হাটে-বাজারে যাতায়াত করে। তাঁদের এই অধঃপতিত অবস্থার কথা সরকার দ্বারা স্বীকৃত। জেলখানার ময়লা পরিষ্কার করার জন্য চণ্ডালজাতির মানুষদেরই ঝাড়ুদার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বলাই বাহুল্য বর্ণহিন্দুদের এই সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন তাদের গাত্রদাহের কারণরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

উচ্চবর্ণসম্ভূত মানুষদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি চণ্ডালদের পুঞ্জিভূত অসন্তোষের স্তুপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিৎ চণ্ডাল মোড়লগণ তৎক্ষণাৎ তাদের জাতিভুক্ত মানুষদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করে। নমঃশূদ্রদের এই বিরাট সামাজিক সভায় বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে সেই সভায় গৃহীত হয়েছিল কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই আন্দোলনকে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের সামাজিক মর্যাদালাভের প্রথম আন্দোলনরূপে। তারা যে বর্ণহিদুদের কোনরূপ সহযোগিতা দানে আর রাজি নয় সে কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল এই সভায় – গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তারই প্রকৃষ্ট প্রমান। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হাটে-বাজারে প্রচার করা হয়েছিল। সিদ্ধান্তগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। নমঃশূদ্ররা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিভুক্ত মানুষদের কোন কাজ আজ থেকে আর করবে না।
২। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতির খাবার তারা কোনভাবেই গ্রহণ করবে না।
৩। নমঃশূদ্র রমণীরা যথেচ্ছভাবে হাটে-বাজারে যাওয়া বন্ধ করবে।
৪। জেলখানায় নমঃশূদ্র কয়েদীদের প্রতি অন্যান্য জাতির কয়েদীদের অসম্মানসূচক আচরণ তারা আর মেনে নেবে না।

৫। নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত সমহীন দুঃস্থ শ্রমিকদের দায়িত্ব নমঃশূদ্র সমাজ গ্রহণ করবে।
৬। নমঃশূদ্র জাতির সমস্ত মানুষকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত মান্য করতেই হবে।
৭। যদি কেউ এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অমান্য করে তবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে।[৪] এই ধরনের অসহযোগ আন্দোলনের ফলে হতদরিদ্র মানুষেরা বিরূপ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে যা তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল যে তাদের আতীয়স্বজনরা উদরপূর্তির ব্যবস্থা করবে। এই মর্মে তারা ছিল অতিমাত্রায় সচেতন কারণ স্বজনহীনদের কথাও তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যই চণ্ডাল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল। আবার সমগ্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উৎসাহিত করার জন্য একথাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের এই সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী নয়, বরং সরকার তাদের পক্ষেই রয়েছে। স্বভাবতই নমঃশূদ্র জাতির মোড়লদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভবপর হয়েছিল যে, যারা উপরোক্ত প্রস্তাবাদি অবমাননা করবে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে।

এই আন্দোলন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থানে তা বিস্তার লাভ করেছিল দাবানলের গতিতে। গোপালগঞ্জ থানা রূপান্তরিত হয়েছিল এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে। এই আন্দোলন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মনে যে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ফরিদপুরের তৎকালীন জেলাশাসকের পত্র। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আটই (8th) এপ্রিল তিনি ঢাকার কমিশনারের কাছে প্রেরিত পত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, এই আন্দোলন এতটাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল যে কৃষিক্ষেত্র ছিল অকর্ষিত, গৃহ ছিল অনাচ্ছাদিত এবং কোন চণ্ডালই হিন্দু অথবা মুসলমানদের সেবাদানে ছিল একান্তভাবেই বিমুখ। নমঃশূদ্রদের কোন মহিলাকেই আর হাটে-বাজারে দেখা যায় নি। গোপালগঞ্জ এবং মুকসুদপুরের পরিস্থিতি এমন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভাগীয় প্রধান কার্যালয় থেকে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল উপদ্রুত অঞ্চলে। (The strike was so complete that the fields untilled, the houses unthatched, and not a Chandal in the service of Hindu or Muhammedan, or a Chandal woman was seen in any market. The situation was so volatile in Muksudpour and Gopalganj that extra police had to be mobilized from the divisional headquarter for maintaining peace and order).[৫] উচ্চবর্ণসম্ভূত মানুষেরা এরূপ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল সে কথা কোনভাবেই বলা যাবে না। তারা নমঃশূদ্রদের এই ধর্মঘট (strike) বানচাল করার প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা বুঝিছিল যে চণ্ডালদের বাদ দিয়ে কায়িক পরিশ্রমের কোন কাজ সম্পন্ন করাই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বর্ণহিন্দুরা তাদের নতি স্বীকারে বাধ্য করতে চেয়েছিল। এমন কি তারা জোরজুলুম করে চণ্ডালদের এই আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় নি, বরং ব্যর্থ হয়েছিল চূড়ান্তভাবে। বর্ণহিন্দুদের পেশীশক্তি প্রদর্শন থেকে নিরস্ত করেছিল ব্রিটিশ সরকারের পুলিশবাহিনী। তারা আন্দোলনকারীদের দিকে প্রশস্ত করেছিল সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত। আর এভাবেই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের প্রথম গণ আন্দোলন দর্শন করেছিল সাফল্যের মুখ।[৬] জাড্য ঘুমে আচ্ছন্ন চণ্ডাল সমাজের প্রথম নিদ্রাভঙ্গ ঘটেছিল এই আন্দোলনের দুর্বার অভিঘাতে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনের ফলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল যা তারা নিজেদের অধঃপতিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অন্ততপক্ষে দ্বিবিধ কারণে তাদের পক্ষে এই আন্দোলন নিরবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ সময়কালব্যাপী চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথমত, এদের সংখ্যাগরিষ্ট অংশই ছিল অশিক্ষিত এবং দারিদ্রপীড়িত। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উদরপূর্তির ব্যবস্থা করাই ছিল তাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। অস্তিত্বরক্ষার লড়াইকে বাদ দিয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লড়াই চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে

অকল্পনীয় হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, বর্ণহিন্দুরা ছিল তাদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বলিয়ান বর্ণহিন্দুরা ছিল তাদের এরূপ প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রতিবন্ধক। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের উপর তাদের নির্ভরশীলতার মাত্রা এত বেশী ছিল যে দীর্ঘদিন তাদের বিরুদ্ধাচরণ নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এই ঐতিহাসিক ঘটনার দিগন্তবিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল নমঃশূদ্র সমাজের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের অধঃপতিত সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিল এবং সরকারের কাছে এই দাবী তুলে ধরেছিল যে সরকারের সমস্ত নথিপত্রাদিতে তাদের যেন চণ্ডাল নামে চিহ্নিত না করা হয়। চণ্ডালের পরিবর্তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নমঃশূদ্র শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। তাদের জাতি মর্যাদা লাভের এই দাবীকে ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতেই দেখেছিল। শ্রীহট্টের তৎকালীন ইংরেজ সহ-কমিশনার এই মর্মে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে সরকারী নির্দেশনামা জারি করেছিলেন তার মধ্য দিয়েই বিষয়টি প্রমাণিত। ঐ সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল যে, নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষেরা সর্বদাই নমঃশূদ্র লিখবে এবং কোন অবস্থাতেই 'চণ্ডাল' শব্দটি ব্যবহার করবে না। যদি কেউ নমঃশূদ্র না লেখে তবে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। "(The Namasudra must always be written and not change 'Chandal' for all persons of the said caste. Anyone who does not write 'Namasudra' shall be removed from employment.)"[৭]

এই ধরনের জাতির মর্যাদা পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সঙ্গে ১৮৮০ দশকের প্রারম্ভেই নমঃশূদ্র জাতি উন্নয়নের আন্দোলনও লাভ করেছিল বাস্তব রূপ। আর এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল পূর্ববৎ এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার দত্তডাঙ্গা গ্রামে জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র গাইনের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খুলনা ছাড়াও অন্যান্য জেলার বিশিষ্ট সমাজপতিরা, গ্রামের মোড়লরা এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। এখানে উপস্থিত মানুষের (অবশ্যই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত) সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশী। পতিত, অচ্ছ্যুৎবর্গের মানুষদের ঐক্যবদ্ধকরণের এই সুবর্ণ সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন ঠাকুর গুরুচাঁদ। শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষকে ঐক্যের বেদমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে আত্মচৈতন্যবোধে জাগ্রতকরণের এই মহান প্রয়াস বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের বোধেন্দ্রিয়লোকে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই সভার সূচনা মসৃনতর ছিল না, কারণ সে সময় এই ধরনের সভার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই গুঞ্জন উত্থাপিত হয়েছিল।[৮] অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের ঐক্যভাবনার দুর্বলতার বিষয়টি এই ধরনের গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলার আকাশে-বাতাসে যখন আত্মজাগৃতির বার্তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তখন এই ধরনের সভার প্রয়োজনীয়তাকে শেষ পর্যন্ত কেউই উপেক্ষা করতে পারে নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যজ জাতির মানুষের মননে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, চৈতন্যের বিনাশ, ঐক্যবদ্ধতার চেতনা বা প্রয়োজনীয়তা যে তেমনভাবে জাগরুক ছিল না তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। অহেতুক ঢাল, সড়কি নিয়ে বীরত্ব প্রকাশ, অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সম্মুখ সমরের রীতিকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টা, এবং আত্মকলহ ও অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যকে সঙ্গী করে অযথা নিজেদের শক্তিক্ষয়ের প্রবণতা তৎকালীন যুগের নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে ছিল সুস্পষ্ট। গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের এই ধরনের মানসিকতা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল। আর তাদের এই মূঢ়ত্ব, অজ্ঞতা ও চেতনাহীনতাকে অপসৃত করে ঐক্যের চেতনায় তাদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সঠিক মঞ্চ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গাইনের মাতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে। তাই এরূপ মন্তব্য হয়তো অতিরঞ্জিত হবে না যে, দত্তডাঙ্গার সমাবেশ ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধতা ও নবজাগৃতির জয়যাত্রা।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দত্তডাঙ্গার মহাসভায় যখন ঠাকুর গুরুচাঁদ তাঁর স্বজাতীয় মানুষদের জাগ্রতকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন তখন সর্বভারতীয় স্তরে কোন রাজনৈতিক দলেরই পত্তন ঘটেনি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ভারতবাসীর মনে ঔপনিবেশিক শাসন বা পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন ও মুক্তি লাভের মহাকাজে উদ্বেলিত হওয়ার দুর্জয় বাসনা জাগরিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চার বছর পূর্বেই ঈশ্বর গাইনের বাড়ীতে গুরুচাঁদ শুনিয়েছিলেন নিম্নবর্ণীয় ও নিম্নবর্গীয় মানুষদের মুক্তির কথা। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন সামাজিক সাম্যের বার্তা। সেদিন তাঁর বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার আশাভরসার কথা। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসককূলের কাছ থেকে শাসনভার ছিনিয়ে নিতে, আর গুরুচাঁদ চেয়েছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করতে, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে। তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা দখল করার পূর্বে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের সামাজিক মুক্তি। তাদের মুক্তিলাভের বিষয়টিকেই তিনি বস্তুতপক্ষে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন।[৯] জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের বিতাড়িতকরণের জন্য সাধারণ ভারতবাসীর মনে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত করে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর গুরুচাঁদ দত্তডাঙ্গার মহাসভায় তাঁর অভিভাষণের মধ্য দিয়ে নিপীড়িত, বঞ্চিত, দরিদ্র এবং আত্মমর্যাদা বিবর্জিত অন্ত্যজ জাতির মানুষদের চেতনায় ও দেহ-ইন্দ্রিয়ের সমগ্র সত্তায় প্রচন্ড আঘাত হেনে তাদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হয়েছিলেন মুক্তি ও সাম্যের বাণী। আর তাই দত্তডাঙ্গার মহাসভার পর তাদের মধ্যে যে জাগরণের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল তাতে তারা পিছনের দিকে না তাকিয়ে বা ফলাফলের কথা চিন্তা না করেই, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, হাটে-গঞ্জে-বন্দরে অনমনীয় ও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল। এই আন্দোলন কোন আপতিক বা তাৎক্ষণিক ঘটনা ছিল না। কারণ এর রেশ পরবর্তী সময়কালেও ছিল ফল্গুধারার ন্যায় প্রবহমান।

দত্তডাঙ্গার গাইন বাড়ীর শ্রাদ্ধবাসরের পর থেকে নমঃশূদ্র সমাজের প্রতিটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান রূপান্তরিত হয়েছিল একটি সমাজ উন্নয়ন সভায়। এই সমস্ত সভাগুলিকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নেতাগণ ও মোড়লরা জাতি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত সভার মধ্য দিয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল পিছড়ে বর্গের জাতি ও শ্রেণী চেতনার মাধ্যম রূপে। নমঃশূদ্র জাতির আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলন, জাতি উন্নয়নের আন্দোলন এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ সম্বন্ধীয় আন্দোলন সমূহ শেষ পর্যন্ত গ্রথিত হতে থাকে একই সূত্রে। তাদের এই সমস্ত আন্দোলন কোন বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ঐক্যবদ্ধভাবে তারা যে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে তাদের মনে এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হয়েছিল জাতিভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আসামের কাছাড় থেকে পূর্ববঙ্গের যশোহর, নড়াইল, মাগুরা, বাখরগঞ্জের ফিরোজপুর, ফরিদপুরে গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষেরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল পৃথক পৃথক ভাবে। এর মধ্যে ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি নামক গ্রাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই গ্রাম থেকেই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর।[১০] ওড়াকান্দিকে তারা রূপান্তরিত করেছিলেন অন্ত্যজদের আন্দোলনের মূল কেন্দ্রে। তাছাড়াও খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ইত্যাদি স্থান থেকে নমঃশূদ্ররা সম্মিলিত ভাবে তাদের উন্নয়নমূলক নানা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে এবং সেগুলিকে বাস্তব রূপদানের জন্যও তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অন্ত্যজ জাতির মধ্য থেকে আবির্ভাব ঘটেছিল বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষের। এর আন্দোলন ও জাগরণ মূলত ফরিদপুরকেন্দ্রিক হলেও যশোর, খুলনা ও বরিশাল এর বৃত্তভুক্ত হয়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন তাদের মধ্যমণি। তাঁর শোষণমুক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বদেব দাস, উপেন্দ্রনাথ বর্মন, ক্ষীরোদ বিহারী, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক প্রমুখ বাংলার নমঃশূদ্র সমাজের যুবকেরা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর বঙ্গভঙ্গকে সমর্থনকল্পে ফরিদপুরের ওড়াকান্দিতে নমঃশূদ্র জমিদার ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে নমঃশূদ্রদের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্তন জানিয়ে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রথমত, ভারত সচিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়েছিল যে, এই সভা

তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কারণ তিনি বাস্তব ঘটনা রূপেই বঙ্গ বিভাজনের কথা ঘোষণা করেছেন এবং এই মর্মে কোনরূপ সংশোধন আনয়নের কথা বলেন নি। (The meeting is greatly indebted to the Secretary of State for India for his declaring the partition of Bengal as a settled fact and admissible of no amendment)। দ্বিতীয়ত, এই সভা মাননীয় মিঃ হেয়ারের কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাচ্ছে যে তিনি যেন মুসলমানদের মতোই নমঃশূদ্রদেরও একই অধিকার ও সুযোগসুবিধা প্রদান করেন। কারণ নমঃশূদ্ররা ও মুসলমানরা হল পূর্ববঙ্গের নিয়ামক সম্প্রদায় এবং মুসলমানরা নমঃশূদ্রদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল, তারা হিন্দুদের মতো নয়। (This meeting prays most earnestly that the Hon'ble Mr. Hare will bestow the same rights and privileges upon the Namasudras as have been done upon the Muhammedans, in as much as the Namasudras and the Muhammedans are predominating communities of Eastern Bengal, and the latter unlike the Hindus possess a good deal of sympathy for the Namasudras)।[১১] তৃতীয়ত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মানুষদের পছন্দহীনতা ও ঘৃণার জন্যই এই বৃহৎ নমঃশূদ্র সম্প্রদায় আজও অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ রয়ে গেছে। তাই এই সম্প্রদায়ের মানুষদের তাদের প্রতি এবং তাদের আন্দোলনের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। অতঃপর তারা মুসলিম ভাইদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাবে। (It is simply owing to the dislike and hatred of the Brahmins, the Vaidyas and the Kayasthas that this vast Namasudra community has remained Backward; this community has therefore, not the least sympathy with them and their agitation, and will henceforth work hand in hand with their Muhammedan Brethren)।[১২] উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদির মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার যে তারা নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের অবর্ণনীয় দূরাবস্থার জন্য বর্ণহিন্দুদের উপর দোষারোপ করেছিল সম্পূর্ণরূপে। আর যেহেতু বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল বর্ণহিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত তাই ঐ আন্দোলনের প্রতি তাদের কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না। আবার এই মর্মে তারা উদাসীন ছিল সে কথাও বলা যাবে না। বরং তারা মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী কাজ করে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল অত্যন্ত সচেতনভাবে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য মুসলিমদের সমতুল্য সুযোগসুবিধার দাবী করে ছোট লাট মিঃ হেয়ারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন। সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদের ন্যায় সংরক্ষণের দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছিলেন নমঃশূদ্র নেতৃবর্গ। ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের সুযোগ হাতছাড়া করে নি। তাদের অনুসৃত 'Divide and Rule Policy' -কে গতিশীল করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবর্তন করেছিল 'Proportional Representation of Communities in Public Employment Act' বা সরকারী নিয়োগে জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বমূলক আইন। এর ফলে সদ্যশিক্ষিত কতিপয় নমঃশূদ্র যুবকদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছিল সরকারী চাকুরি লাভের সুযোগ। শশীভূষণ ছিলেন প্রথম নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত যুবক, যিনি সাবরেজিস্ট্রারের চাকুরি পেয়েছিলেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমুদ বিহারী মল্লিক ডেপউটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডাঃ তারিণীচরণ বালা সরকারী চিকিৎসকের চাকুরি পেয়েছিলেন।[১৩]

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোরের নড়াইলে নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল গ্রামে গ্রামে নমঃশূদ্র সমিতি গঠন এবং পনেরটি গ্রাম নিয়ে একটি 'Union Committee' গঠন। সে সময় বলা হয়েছিল যে, এই সমস্ত কমিটি জেলা সমিতির অধীনে কাজ করবে এবং নমঃশূদ্রদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে নিয়মিতভাবে। এই সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি গ্রামবাসীর কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগৃহীত হবে এবং এই চাল সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করবে গ্রাম সমিতির প্রতিনিধিরা। গ্রাম সমিতির সদস্যরা এই নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে

নিজেরা এক আনা চাঁদা প্রদানে বাধ্য ছিল। আবার যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন 'Union Committee'-র সদস্য তাদের উপর ধার্য করা হয়েছিল দুই আনা চাঁদা। এছাড়াও তারা প্রতিটি শ্রাদ্ধ-বিবাহাদির মোট ব্যয়ের তিন শতাংশ 'Union Committee' দান করবেন একথাও উক্ত সম্মেলনে ঘোষিত হয়েছিল।[১৪] নবগঠিত এইসব সমিতির সংগঠিত কার্যক্রমের ফলে 'Union Committee' সমাজে যে প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চার হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে তারা নিশ্চিতভাবেই নতুন পথের দিশা লাভ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকেরাও জেগে উঠেছিল নব্যশিক্ষিত যুবকদের মতোই। মুসলিমরা যখন তাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া জানিয়ে সরকারের কাছে ডেপুটেশন দিচ্ছিলেন এবং মুসলিম লীগ তৈরী করে তাদের দাবী আদায় করার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছিল তখন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে কৃষকেরা ভাগচাষে 'ধানকড়ারী' প্রথার পরিবর্তে তেভাগা বা উতপাদিত ফসলের তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ আদায়ের জন্য যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল তা অতি অল্প দিনের উত্তাল হয়ে উঠেছিল অ্যান্ড দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এই তেভাগা আন্দোলনে কেবলমাত্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকেরাই নয়, মুসলমান কৃষকেরাও যোগ দিতে শুরু করেছিল। ক্রমে মুসলমান কৃষকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নমঃশূদ্র কৃষকরা এই তেভাগা আন্দোলনকে শক্তিশালী রূপ দান করেছিল পূর্ববঙ্গের যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের বিভিন্ন গ্রামে। ইংরেজদের গোপন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষকরা ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মধ্যেই জমিদারদের বাজার, বাড়ী ঘরদোর লুটপাট করতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে ফরিদপুরের শিঙ্গাগ্রামের সহিংস ঘটনার কথা উল্লেখ্য। ওড়াকান্দির পূর্বদিকের শিঙ্গাগ্রামের নমঃশূদ্র কৃষকেরা জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে জমিদারের এই কর্মচারীকে প্রবলভাবে প্রহার করেছিল যে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করিয়েও তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় নি।[১৫] স্থানীয় পুলিশ গৃহিণী উত্তেজিত কৃষকদের কোনোভাবেই শান্ত করতে পারে নি। বরং পুলিশ গ্রামে এসে উপস্থিত হলে তাদের উপরে চড়াও হতেও আন্দোলনকারীরা পিছপা হতো না। বিদ্রোহী কৃষকদের সহিংস ক্রিয়াকলাপে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জমিদারের কর্মচারীরা অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জমিদার ও ইংরেজ প্রশাসনের কাছেও আন্দোলনকারীরা বিশেষভাবে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষকেরা আতঙ্কের কারণরূপে প্রতিভাত হয়েছিল।[১৬]

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলিমদের জন্য পৃথম নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী গ্রাহ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র নেতৃবর্গও কালবিলম্ব না করে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী উত্থাপন করেছিলেন অস্পৃশ্যদের জন্য। এই সময় তারা ইংরেজ সরকারের কাছে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছিলেন তা হল, তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ বা ধর্মীয় প্রথা-পরম্পরা ব্রাহ্মণদেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন জাতির সঙ্গে তাদের সামান্যতম যোগসূত্রটুকুও নেই। তাই সরকারের কাছে তাদের একান্ত অনুরোধ যে, সরকার যেন তাদের পৃথক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি-দানপূর্বক মুসলমানদের মতোই রাজনৈতিক অধিকার দান করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি প্রতিবেদনে চণ্ডাল নামকরণের অবলুপ্তি ঘটিয়ে অন্ত্যজ জাতির মানুষদের চিহ্নিত করা হয় নমঃশূদ্র নামে। তাদের দীর্ঘ ত্রিশ বছরের দাবি এইভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে তারা থেমে থাকে নি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নমঃশূদ্র প্রতিনিধিবৃন্দ ছোট লাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্ত্যজ জাতিভুক্ত মানুষদের দাবীদাওয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহযোগিতা দানের অনুরোধ জানিয়ে একটি স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।[১৭] ঐ বছরেই (১৯১২) বাংলার বাইশটি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'The Bengal Namasudra Association' নামে একটি বৃহদাকারের সংগঠন। এই সংগঠনটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার নমঃশূদ্র অধ্যূষিত গ্রামগুলির অন্ত্যজ জাতিভুক্ত সুসংগঠিত করা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে সামিল হতে পারে। এই মর্মে বোধহয় সর্বাগ্রগণ্য ছিল পূর্ববঙ্গের যশোর জেলা। এই জেলায় 'এগারো গ্রাম', 'ছাপ্পান্ন গ্রাম', 'ছিয়ানব্বই গ্রাম', 'একশো সাতাশ গ্রাম' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে গড়ে উঠেছিল

বহুবিশিষ্ট নমঃশূদ্র সমিতি। নমঃশূদ্রদের অস্পৃশ্যতা বিরোধী জাতিমর্যাদা পুনরুদ্ধার আন্দোলন ধীরে ধীরে অন্ত্যজ জাতির মানুষদের সার্বিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দবিহারী মল্লিকের সভাপরিত্বে 'All Bengal Namasudra Association' নামে একট নতুন সংগঠন প্রতিষ্টিত হয়েছিল। সারা বাংলার নমঃশূদ্রদের স্বার্থ সুরক্ষিতকরণই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী সময়কালে বিশেষ পরিস্থিতিতে 'All Bengal Namasudra Association' যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত নিখিল ভারত তফশীলি ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তৎপূর্ব সময়কাল পর্যন্ত এই সঙ্গঠনই বাংলার নমঃশূদ্র সমাজের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। নমঃশূদ্র সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সংগঠনটি হোমরুল লীগের বিরোধিতা করেছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ হোমরুল লীগকে চিহ্নিত করেছিলেন হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার সোপান রূপে। সমগোত্রীয় বক্তব্য অনুরণিত হয়েছিল নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে। এ প্রসঙ্গে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "The Namasudra response was also in the same tune. As the nationalists demanded self-government, the educated members o this caste apprehended that it more privileged was transferred, it would only monopolized by the more privileged upper castes।"[১৮] নমঃশূদ্র নেতৃবর্গ অতঃপর ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের সহায়তায় হোমরুলের বিরুদ্ধাচরণপূর্বক অগ্রবর্তী হয়েছিল গণ আন্দোলনের পথে। অবশ্যই যে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর অন্যান্য নমঃশূদ্র মানুষের তিনশত প্রতিনিধি এক অধিবেশনে মিলিত হয়েছিল কলকাতার ডালহৌসি ইন্সটিটিউটে। এই অধিবেশনে তাঁরা অনেকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা বৃটিশ শাসকের প্রতি জানিয়েছিলেন তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতমাধব মন্টেগু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীভূত হয়ে থেকে ভারতবর্ষে ক্রমশ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং শাসনকার্যে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান হারে নিযুক্ত করা হল ইংরেজ শাসনের উদ্দেশ্য। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্টেগু বেমনফোর্ড (ভারতের বড় লাট, ১৯১৫-২১) প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নাম হয়েছিল গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯। এই আইনের বলে প্রাদেশিক সরকারগুলি পূর্বের তুলনায় সুনির্দিষ্টভাবে বিচার, জেলখানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ..., বণবিভাগ, রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি ব্যাপারে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল এবং প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে প্রবর্তিত হয়েছিল 'Diarchy' বা দ্বৈতশাসন নামে এক নতুন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের দিক দিয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের পর কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রগতি সূচীত হয়েছিল একথা সত্য। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছিলেন বলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার বিধি তাদের তুষ্ট করতে পারে নি। বিপুল রাজনৈতিক উত্তেজনায় প্লাবিত হয়েছিল সমগ্র দেশ। এরূপ পরিস্থিতিতে নমঃশূদ্র নেতৃবর্গ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। ইতিপূর্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তারা পূর্ববর্তী বছরের মতোই অধিবেশন মিলিত হয়েছিলেন ডালহৌসী ইন্সটিটিউটে।[১৯] বাংলা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও সেদিন সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছিল অন্ত্যজ জাতিভুক্ত মানুষদের উপস্থিতির কথা। কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতারা নন। পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, উত্তরাঙ্গের রাজবংশী, কাপালি ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলি শুদ্রজাতিভুক্ত নেতৃবর্গও এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা এই সংস্কারমূলক পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন। তবে বর্ণহিন্দুদের প্রতি তাদের ক্ষোভ, উষ্মা, অভিযোগ ও অবিশ্বাসের কথা তুলে ধরতে বিস্মৃত হন নি। তাদের বক্তব্য ছিল, প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু নেতাগণ প্রতিবন্ধকতার প্রাকার অতি অবশ্যই গড়ে তুলবে। তাই কেবলমাত্র বর্ণহিন্দু নয়, সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৯০টি জাতির প্রতিনিধিদের যোগদানের মধ্য দিয়ে যাতে সরকার গঠিত হয় সেদিকে অতি অবশ্যই নিক্ষেপ করতে হবে সজাগ দৃষ্টি। বিভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের দাবী তারা সে সময় উত্থাপন করেছিলেন। নমঃশূদ্র

জাতিভুক্ত মানুষদের স্বার্থ যাতে কোনমতেই বিঘ্নিত না হয় সে জন্য তারা মুষ্টিমেয় জাতির অধিক ক্ষমতার ভিত্তিতে যাতে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা কোনভাবেই গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত নেতারা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রীধারী প্রখ্যাত আইনজীবী তথা নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের কথা উল্লেখ্য।[২০] প্রথম নমঃশূদ্র মন্ত্রী মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৯টি আসন বিশিষ্ট বাংলার আইন পরিষদে অধঃপতিত শ্রেণীর জন্য ১১টি আসন দাবী করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনে তাঁর এই দাবী উপেক্ষিত হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। উক্ত আইনে বলা হয়েছিল যে বাংলার আইন পরিষদে এক অধঃপতিত শ্রেণীর সদস্য মনোনীত সদস্য (Nominated member) হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন। ব্রিটিশ সরকার তার অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে (Divide and Rule Policy) নমঃশূদ্রদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও অন্ত্যজ জাতির রাজনৈতিক চেতনা ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি ছিল যথেষ্ট সন্দিহান। উক্ত সময়কালেই ব্রিটিশদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, সমকালীন পরিমণ্ডলে অন্ত্যজ জাতির মধ্যে কেউই রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কেও যথাযথভাবে সজাগ নয়। বলাই বাহুল্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও ব্যয় না করে তারা যেটুকু পেয়েছিলেন তাতেই সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অধ”পতিত জাতির জন্য একজন মনোনীত সদস্যের কথা বলে হলেও বাংলার ক্ষেত্রে পাঁচটি আসন তাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল যেগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করার কথা বলা হয়েছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের .... আইনে। অর্থাৎ এই পাঁচজন হবেন নির্বাচিত সদস্য বা ‘Selected Members’। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বরিশাল কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন নীরোদ বিহারী মল্লিক।[২১] ভীষ্মদেব দাস বাংলার আইন পরিষদে প্রবেশ করেছিলেন মনোনীত সদস্য হিসাবে।[২২] গুরুচাঁদ ঠাকুরের ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও নোয়াখালি কেন্দ্রে রসিকলাল চর্মকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়েছিলেন মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। নোয়াখালির বর্ণহিন্দুরা মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের পরাজয় নিশ্চিত করতে সম্মিলিতভাবে ভোট দিয়েছিল রসিকলাল চর্মকারকে। জীবনের গোধূলি লগ্নে উপস্থিত হয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পক্ষে ভোটের প্রচারের জন্য সুদূর নোয়াখালি যাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। একদিকে গুরু ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ, আর অন্যদিকে অধিকাংশ নমঃশূদ্রদের তখন ভোটাধিকার ছিল না। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিভাষানুযায়ী, “The Guru could hardly do anything for other constituencies where most of the Namasudras possibly did not have the voting right.” পূর্ববঙ্গের দুইজন সদস্য ছাড়াও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের পোদ বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় নেতা বাবু হেমচন্দ্র নস্কর[২৩] এবং উত্তরবঙ্গের কোচ তথা রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতা বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মন[২৪] এবং বাবু প্রসন্নদেব রাইকত।[২৫] বাংলার আইন সভায় প্রবেশের পর অন্ত্যজ জাতির সদস্যরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন অতিমাত্রায় তৎপর। তাঁরা নমঃশূদ্র জাতির আন্দোলনকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে আইনসভার অভ্যন্তরে এবং বাইরে সরব ছিলেন সততই।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় অবশ্য নমঃশূদ্র জাতির নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুগামীরা ছিলেন একান্তভাবেই নীরব ও নিস্পৃহ। জাতির মানুষদের আন্দোলনে তেমনভাবে সামিল করতে না পেরে গান্ধীজীর পরামর্শক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সদলবলে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। গুরুচাঁদ দেশবন্ধুকে যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত ছিল যে, “রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়া নমঃশূদ্রগণ গভর্নমেন্টের সহিত কোনপ্রকার সহযোগ করিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় তাহাদিগকে গভর্নমেন্টের অসহযোগ করিতে থাকা না থাকা উভয়ই সমান। দেশের নেতৃগণ এইপ্রকার আন্দোলনে তাহাদের শক্তি সম্পূর্ণ নিয়োগ না করিয়া অনুন্নত সমাজের উদ্ধার করিলে অধিকতর অল্প সময়ে স্বরাজলাভের সম্ভাবনা হইত।” অতঃপর গান্ধীজী স্বয়ং সভা করার জন্য বরিশালে

এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের পাশাপাশি নমঃশূদ্র, রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষকে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল করা। কিন্তু গান্ধীজীর প্রকাশ্য জনসভায় জনসমাগম আদৌ ঘটে নি। কিন্তু কেন? গান্ধীজীর দিকে সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে এই অসহযোগিতার সঠিক কারণ কি? সাধারণ মানুষ ঠিক কি কারণে এতো উদাসীন? গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে বরিশাল কংগ্রেস কমিটি বলেছিল, কংগ্রেসি আন্দোলনের প্রতি অনীহার জন্যই গান্ধীজীর সভায় জনসমাগম ঘটে নি। বলাই বাহুল্য এই অসন্তুষ্ট জনসমষ্টি ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষককূল।[২৬] বাংলার এই অংশে এক বিরাট সংখ্যক নমঃশূদ্র বসবাস করতো যারা ইতিমধ্যেই গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে এবং রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর মত ও পথের অনুসারীতে।

গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের কয়েক মাসের মধ্যেই নমঃশূদ্রদের আন্দোলন ধারণ করেছিল নতুন রূপ। তাদের এই আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছিল গান্ধী বিরোধী আন্দোলনে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নমঃশূদ্রদের এক বিরাট মাপের সমাবেশ আহূত হয়েছিল (পূর্ব বাংলার) পীয়োজপুরে। এই সমাবেশে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন নমঃশূদ্রদের বিশিষ্ট নেতা রজনীকান্ত দাস। এতে নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নতিকল্পে যে ইস্তাহার তারা প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল একান্তভাবেই গান্ধীবিরোধী এবং গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ব্যালেঞ্জস্বরূপ। তাদের এই ইস্তাহারকে গান্ধীবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে খোলা চিঠি রূপে চিহ্নিত করলেও হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের তীব্র কংগ্রেস বিরোধী মানসিকতা লক্ষ্য করে গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দেই খুলনায় আহ্বান করেন নমঃশূদ্রদের এক মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল নিখলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতি বা 'All Bengal Namasudra Association', আর সম্মেলনের স্থান ছিল খুলনা শহরের টাটো হল ময়দান। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সমিতির সদস্যরা এই মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তাছাড়াও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল দূরদূরান্তের, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামেরও মানুষ। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাই ছিল গরিষ্ঠ। হাজার হাজার মানুষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যোগদান করেছিল এই মহাসম্মেলনে। কেবলমাত্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাই নয়, চাকুরীজীবী, আইনজীবী, শিক্ষিত, এক কথায় নমঃশূদ্র সমাজের প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে ঠাকুর গুরুচাঁদ সমবেত জনসমষ্টিকে শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২৭] তাঁর এই আহ্বানে সমগ্র পূর্ব ভারতব্যাপী নমঃশূদ্র জাগরণ আন্দোলনের সাড়া পড়ে যায়। শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্পে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা জেগে উঠতে থাকে।

নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আর সেজন্যই এই সমস্ত পত্রপত্রিকার প্রকাশনা উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নমঃশূদ্রদের সমাজ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিকল্পে 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা যাত্রারম্ভ করেছিল ওড়াকান্দি থেকে অবশ্যই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সৌজন্যে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আদিত্য চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ সুরেন্দ্র ঠাকুর এবং স্বত্বাধিকারী গুরুচাঁদ ঠাকুর। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল 'নমঃশূদ্র সুহৃদ'-এ। নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের ইংরেজ শাসককূল কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন কংগ্রেস কর্মীরা আদৌ ভালো চোখে দেখে নি, বরং তাদের বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া নমঃশূদ্র কর্মীবৃন্দ কংগ্রেসিদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিল। এমতাবস্থায় নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ এই পত্রিকাকেই বেছে নিয়েছিল তাদের ক্ষোভ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যমরূপে। এই পত্রিকাতেই তারা বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। নমঃশূদ্র মানুষেরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের হাতে রান্না করা খাবার শুধু গ্রহণ করবে না তাই নয়। এই খাদ্য তাদের কাছে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকায় প্রকাশিত আবেদনের মাধ্যমে।[২৮] ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 'নমঃশূদ্র' শীর্ষক পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র দাশ। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ব্রিটিশ শাসককূল তাঁকে চিহ্নিত করেছিল সরকারের কাছে বিপজ্জনক এক ব্যক্তিরূপে। এমতাবস্থায়

পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে আয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। এর এক বছর পর ঝালোকাঠি জাতীয় বিদ্যালয়ের (Jhalokathi National School) অনাথবন্ধু সেন পত্রিকাটিকে পুনঃপ্রকাশনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে ধীরে ধীরে পত্রিকাটি জনসমর্থন হারাতে থাকে। পত্রিকার ব্রিটিশ বিরোধিতা নমঃশূদ্র জাতির মানুষদের মনঃপুত ছিল না। 1908 খ্রীষ্টাব্দে 'নমঃশূদ্র' পত্রিকার প্রকাশনার সংখ্যা ছিল পাঁচশত। অন্যদিকে 'সুহৃদ'-এর প্রকাশনার সংখ্যা ছিল পাঁচশত পঞ্চাশ। 1910 খ্রীষ্টাব্দে যখন জাতীয়তাবাদীরা 'নমঃশূদ্র' পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তখন তার প্রকাশনার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনশততে নেমে আসে। সে সময় 'সুহৃদ'-এর সংখ্যা ছিল চারশত পঞ্চাশ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন আদম সুমারির কাজ আরম্ভ হয় তখন দেখা যায় যে, 'নমঃশূদ্র' পত্রিকার প্রকাশনা সংখ্যা তিনশততেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অথচ 'সুহৃদ'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় সাতশতে গিয়ে পৌঁছায়।[২৯]

পত্রপত্রিকা, অবশ্যই নমঃশূদ্র মানুষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, প্রকাশনার ব্যাপারে পূর্ব বাংলা অগ্রগামী হলেও পশ্চিম বাংলা একেবারেই পশ্চাদপদ ছিল সে কথা কোনভাবেই বলা যাবে না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অস্পৃশ্য পৌন্ড্রক্ষত্রিয় কূলতিলক রাইচরণ সর্দার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ডহারবার থেকে জাত্যাভিমান জাগরণের উদ্দেশ্যে নমঃশূদ্রদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করেন 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' শীর্ষক পত্রিকা। ঠিক একইভাবে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঢাকা থেকে 'নমঃশূদ্র হিতৈষী' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে তখনই কলকাতা থেকে যাত্রারম্ভ করেছিল 'পতাকা' শীর্ষক পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নমঃশূদ্র নেতা মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। মুকুন্দবাবু 'পতাকা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, "বৃটিশরাজের কৃপায় যাহা একটু জ্ঞানকথা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই জানিতে সমর্থ হইয়াছি যে, আমরা কি ও আমাদের শক্তি কতটুকু। হিন্দু সমাজের অন্ধ হিন্দুরাজের কৃপায় আমরা এতদিন ঘুমাইয়া ছিলাম। এখন, জাতিভেদ জ্ঞানশূন্য, সমদর্শী বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশের কৃপায় জাগিলাম। ...... ব্রিটিশরাজ অশিক্ষিতের বন্ধু, দরিদ্রের চিরসহায়, অনুন্নত জাতিসমূহের আশা-ভরসা। তিনি তোমার সহায় হইবেন।"[৩০] শিক্ষিত নমঃশূদ্রদের ব্রিটিশরাজের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও অন্ধভক্তির কোন ছেদ পড়ে নি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দেই তারা ব্রিটিশরাজের চিরস্থায়িত্ব কামনা করেছিল। সে সময় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ তৎকালীন বাংলার ছোটলাট স্যার লেন্সলট হেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাদের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হন নি। সে সময় তারা এরূপ আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন চিরকাল অস্তিত্বশীল থাকুক– এই হল তাদের মনোবাঞ্ছা। নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের নেতৃবৃন্দ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্ব থেকেই এবং তারা এই মর্মে নিশ্চিত ছিলেন যে ব্রিটিশরাজের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যাবে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে তাদের বোধ হয় গত্যন্তর ছিল না। তবুও অবশ্য স্বীকার্য বিষয় হল এই যে, সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিতে, রাজ দরবারে দাবিদাওয়া উপস্থাপিত করতে সক্রিয় ও সফল ভূমিকা পালন করেছিল নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলি।

তথ্যসূত্র:

১। যতীন বালা, *'মতুয়া আন্দোলন - নমঃশূদ্রজাতীয় জাগরণ',* চতুর্থ দুনিয়া, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা, পৃঃ ৬৬।

২। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *Caste, Protest and Identity in Colonial India',* The Namasudras of Bengal, 1872 – 1947, Routledge / Curzon, 1997, পৃঃ ৩৪।

৩। উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস (সম্পাঃ), *মতুয়া সুহৃদ, বিশেষ কেন্দ্রীয় মতুয়া মহাসম্মেলন সংকলন,* বাংলা, নদীয়া, ২০০৪, পৃঃ ১৩।

৪। যতীন বালা, পুর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

৫। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

৬। স্বপন কুমার বিশ্বাস, *হরি-গুরুচাঁদ, বাংলার চণ্ডাল ও ভারতবর্ষের বহুজন অভ্যুত্থান,* ওরিয়ন বুক, দিল্লী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪, পৃঃ ৯৪।

৭। *'নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন'*, ২০০৪, পত্রিকা ও স্মরণিকা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬।

৮। সন্তোষ কুমার বারুই, *দত্তডাঙ্গার ঐতিহাসিক সভাঃ একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষা,* চতুর্থ দুনিয়া, আগস্ট ২০০৯, পৃঃ ৫৬।

৯। ঐ, পৃঃ ৬২-৬৩।

১০। পরিমল কুমার রায়, *রাজর্ষি গুরুচাঁদ ও তাঁর শিক্ষা আন্দোলন,* (নবতম সংস্করণ), চাকদহ, নদীয়া, তারিখবিহীন, পৃঃ ৫।

১১। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *Caste, Politics and the Raj, 1872-1937,* University of Calcutta, Department of History, 1990, পৃঃ ৬৫।

১২। এইচ. কোটানি, *Caste System, Untouchability and the Depressed,* স্বপন কুমার বিশ্বাস, হরি-গুরুচাঁদ, বাংলার চণ্ডাল ও ভারতবর্ষের বহুজন শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত; পৃঃ ১১৬।

১৩। কিরণ তালুকদার, *জননায়ক মুকুন্দবিহারী মল্লিক,* কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৪।

১৪। স্বপন কুমার বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩১।

১৫। *'মতুয়া সুহৃদ',* নদীয়া জেলা গুরুচাঁদ ঠাকুর স্মরণ উৎসব কমিটি ও হরি গুরুচাঁদ মতুনা সেবা সংঘ, নদীয়া, ২০০৪, পৃঃ ১৬।

১৬। *Report on the political situation in Eastern Bengal and Assam,* Nov. 1909, Home (Political), January, 1910, progs. No. 127.

১৭। "In July, 1912, a Namasudra delegation met Lord Carmichael, the then Governor of Bengal, and requested him to extend state patronage to the member of their community. The Colonial Government, in response to such petitions, also generously offered numerous benefits and earned the Namasudra's gratitude." শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal,* পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯।

১৮। ঐ, পৃঃ ১০৬

১৯। সদানন্দ বিশ্বাস, *মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ১৬।

২০। মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করেছিলেন। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে তাঁর গভীর দখল ছিল। পরবর্তীকালে তিনি ওকালতি ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা পড়াতেন।

২১। নিরোদ বিহারী মল্লিক ছিলেন কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের ইকনমিক্স-এ অনার্স স্নাতক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এম. এ. পাশ করেছিলেন। তিনি আইনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন ছাড়াও সংস্কৃতে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিপ্রাপ্তও ছিলেন।

২২। ওড়াকান্দির ভীষ্মদেব দাস ছিলেন সুদক্ষ উকিল ও বক্তা। তিনি শুরু করেছিলেন এক অনবদ্য সংগ্রাম, যে সংগ্রাম ছিল আপোষহীন স্বাধীনতার স্বাবলম্বী সংগ্রাম।

২৩। কলকাতার বেলেঘাটার হেমচন্দ্র নস্কর ছিলেন ছোটখাটো জমিদার এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নেতা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও খুলনা-যশোর জেলায় বসবাস করত বিপুল সংখ্যক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ।

২৪। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নেতা রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মন ছিলেন ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য জাগরণের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট বা স্নাতক। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে এম. এ. পাশ করেন এবং পরের বছর ওকালতি পাশ করে আইন ব্যবসা, সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবার কাজ করতে থাকেন অক্লান্তভাবে।

২৫। রাজবংশী সম্প্রদায়ের অপর এক উল্লেখযোগ্য নেতা বাবু প্রসন্নদেব রাইমত ছিলেন বিদ্বান ও সমাজসেবী। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উন্নতিকল্পে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে।

২৬। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - "This apathy was largely due to non-participation of the Namasudra peasantry, who constituted a sigeable section of the population in this part of Bengal."

২৭। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের আন্দোলনে গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন এক দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্ব। আত্মসম্মানের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। পরিমল কুমার রায়, রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর শিক্ষা আন্দোলন, পৃঃ ৭।

২৮। শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, *'সমাজ কল্যাণে মতুয়াদের পক্ষেও মুক্তিলাভের রাজনীতি শুধু প্রযোজ্য নয়, অপরিহার্যও'।* চতুর্থ দুনিয়া, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা, পৃঃ ৪৯।

২৯। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *Caste, Protest and Identity in Colonial India',* পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬।

৩০। স্বপন কুমার বিশ্বাস, হরি-গুরুচাঁদ, বাংলার চণ্ডাল ও ভারতবর্ষের বহুজন অভ্যুত্থান থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১১।